দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন
গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

❋

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার
মিঃ সন্তোষ মণ্ডল

❋

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

❋

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

আজকে যে নবধারার মণ্ডলীর কথা সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে, তার সফল বাস্তবায়নে মণ্ডলীতে সকলেই -বিশপ, পুরোহিত, ধর্মব্রতী, সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত, পরিবার ইত্যাদি- মণ্ডলীতে পালনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা ও দায়িত্বের অধিকারী। বাস্তবিক পক্ষে, মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকার উপর আলোকপাতে এ সংখ্যাটি সাহায্য করবে।

যুবসমাজকে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে গণ্য করব। যুবশক্তিকে ন্যায়, প্রেম, সমৃদ্ধি ও শান্তির এক নতুন দেশ গড়ার জন্য কাজে লাগাতে হবে। তাদের আহ্বান জানানো যাচ্ছে যেন তারা সত্য ও সততার বাসনা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনের ভাবনা, এবং নতুন জীবনধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ঝুঁকি খ্রীষ্টীয় সমাজের পরামর্শক্রমে করেন। সমাজের প্রবক্তা হয়ে ওঠাই হচ্ছে তাদের সুনির্দিষ্ট আহ্বান।

খ্রীষ্টীয় সমাজে নারীরা এখনো পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারেনি। আমরা নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে সমর্থন করব। মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিৎ আর এমন পরিবেশ রচনা করা উচিত, যেন তারা তাদের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মণ্ডলীতে ও সমাজে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজের মঙ্গল এবং মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ভক্তসাধারণের আহ্বান ও অংশগ্রহণ সন্দেহাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের বোঝা দরকার যে, নবধারার মণ্ডলীতে তাদের চূড়ান্ত ভূমিকা পালনে, তাদেরকে অবশ্যই

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

ঐশবাণী ও সংস্কারসমূহের সেবাকর্মী ও সমাজ সংগঠক হয়ে উঠতে হবে, আর তাদের এলাকার সকল মানুষের নিকট, বিশেষ করে যারা অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের নিকট, সুসমাচার ঘোষণা করতে হবে।

বিশপ ও পুরোহিতগণকেও অবশ্যই সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ ক'রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান সেবার জন্য নিবেদিত। খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, বাণীপ্রচার কার্য... অর্থাৎ প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা, ন্যায় ও মিলনের সমাজ গঠন। একেই তো বলে, ঐশরাজ্যের প্রকৃত সেবা। এটাই তো হল, খাঁটি বাণীপ্রচার।

নিপীড়িত-নির্যাতিতদের পক্ষ নেওয়া, তাদের ন্যায্যতার সংগ্রামে সামিল হওয়া, মঙ্গলসমাচারীয় নৈতিকতার আলোকে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ও একে দরিদ্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা করা–এগুলোই হল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মণ্ডলীর প্রধান প্রধান আহ্বান। কেননা মণ্ডলী ঐশরাজ্য–যে রাজ্যের প্রধান মূল্যবোধগুলো হচ্ছে ন্যায্যতা, শান্তি, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব–সেই তার চিহ্ন হয়ে উঠার জন্য আহূত।

অনুষ্ঠেয় সি বি সি আই সাধারণ পরিষদ সভার স্থান এবং প্রধান সামাজিক মূলসুরগুলো

১৯৬৬ নয়াদিল্লী
১৯৭০ ইরনাকুলাম
১৯৭২ মদ্রাজ (উন্নয়নের অধিকার)
১৯৭৪ কলকাতা (খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার, ন্যায্যতা এবং উন্নয়ন, শিক্ষা)
১৯৭৬ হায়দ্রাবাদ ১৯৭৭
১৯৭৭ বোম্বাই (বাধ্যতামূলক পরিবার-পরিকল্পনা)
১৯৭৮ ম্যাঙ্গালোর (দেশের আশু চাহিদাগুলোর প্রতি মণ্ডলীর সাড়াদান, ন্যায্যতা, অন্যায্য কাঠামোসমূহ, বৈষম্য, খ্রীষ্টীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সেবাসমূহ)
১৯৭৯ রাঁচি (মণ্ডলী ও সমাজে খ্রীষ্টীয় পরিবারের ভূমিকা
১৯৮৩ বোম্বাই
১৯৮৪ নাগপুর (ন্যায্যতা, আজকে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা, দরিদ্রতা, মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িকতা)
১৯৮৬ গোয়া, (সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা, দরিদ্রতা ও অন্যায্যতা, ভারতীয় বাস্তবতা, মণ্ডলীতে মনোভাবগত ও সাংগঠনিক পরিবর্তন)
১৯৮৮ কট্টায়াম (জাতীয় সংহতি)
১৯৮৯ শিলং(শিক্ষা, উন্নয়ন, তফসিলী শ্রেণীভুক্ত খ্রীষ্টানগণ, সংখ্যালঘু অধিকার, ক্ষুধা, দুর্নীতি
১৯৯২ পুনা (গর্ভপাত)
১৯৯৪ দিল্লী (আজকে মণ্ডলীর প্রেরণকার্য)
১৯৯৬ ত্রিভান্দ্রম (জনসংখ্যা ও উন্নয়ন)
১৯৯৮ বেনারসী (আজকের মণ্ডলী, দরিদ্রতা ও বিশ্বায়ন, বর্ণ সমস্যা, এ্যাকশন প্রোগ্রাম)
২০০০ চেন্নাই (খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া এবং মঙ্গলসমাচার প্রচার করা, ধর্মপল্লী অগ্রাধিকাসমূহ
২০০২ জলন্ধর (সংলাপ মণ্ডলীর মধ্যে,জগতের সঙ্গে এবং দরিদ্রদের সঙ্গে)
২০০৪ ত্রিচুর (সামাজিক যোগাযোগ)

অধ্যায় ৮

মণ্ডলীতে বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব

কয়েকজনকে এই বইয়ের প্রথম খসড়ার উপর মন্তব্য করার জন্য বলা হলে, তাদের একজন এই অধ্যায়টি পাঠ না করেই বলেছিলেন যে, তার নিকট মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামাজিক দিক দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তার মন্তব্যে হাসি পেলেও, আমার আশা সব পাঠকই একই রকম ভুল করবেন না ! এ অধ্যায়ের কিছু অংশ শুধুমাত্র ঐশতত্ত্ববিদগণের আগ্রহের বিষয় হলেও, **সমগ্র অধ্যায়টি বাস্তবিকপক্ষে আমাদের সকলকে মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে পরিচালক, সাধারণ জনগণ, পরিবার, যুবসমাজ ও নারীজাতির ভূমিকার উপর আলোকপাতে সাহায্য করে।**

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে **মণ্ডলীতে ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে।** এটা পর্যালোচনা করে দেখে নবীকৃত উপায়সমূহ, যে উপায় অবলম্বন ক'রে বিশপ (১), পুরোহিত (২), ধর্মব্রতী (৩) ও সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ (৪), এবং পরিবার (৫), যুবসমাজ (৬) ও নারীজাতি (৭) সবাই আজকের মণ্ডলী ও সমাজে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনে আহূত। সি বি সি আই-র আলোকপাতগুলো মণ্ডলীর নবায়নে ও সমাজে এর সম্পৃক্ততায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ সকল আলোকপাতের কয়েকটি এমনকি অবাক হওয়ার মত। বাস্তবায়িত হলে এগুলো মণ্ডলীকে করে তুলবে অনস্বীকার্য এবং অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক, একই সময়ে এগুলো অনেক বেশী গণমুখী ও জন-হিতকর, আর অনেক বেশী কার্যকর।

এই ৮ অধ্যায়ে সর্বোপরি দেখানো হয়েছে কিভাবে কিছু আদর্শকে, যেগুলো ইতোমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তব রূপদান সম্ভব। এখানে বাস্তব নীতিমালা ও কাঠামো নিয়ে পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। যথারীতি আমরা প্রথমে বিশপগণের শিক্ষা বুঝবার চেষ্টা করব। পরে এ অধ্যায়ের অষ্টম ভাগে তুলে ধরা হবে কিছু সম্পূরক আলোকপাত (৮)। কয়েকজন পাঠকের নিকট কিছু আলোচনা ভাল না-ও লাগতে পারে, তথাপি বিশপগণের বিবৃতিগুলো আমাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানায়, আমাদের যা হওয়া উচিত, তা হয়ে ওঠার জন্য। এ বিবৃতিগুলো একে-অপরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যও আমাদের সাহায্য করতে পারে !

১। বিশপগণ

ভারতীয় মণ্ডলীকে ঈশ্বরের উপাসনার দিকে পরিচালিত করার "আধ্যাত্মিক প্রেরণদায়িত্ব" ও বাণীর সেবাকাজই হচ্ছে বিশপগণের 'প্রধান কাজ'। তাঁরা **'বিশ্বাসীবর্গকে তাদের ধর্মীয় আহ্বান ও জগতে তাদের প্রেরণদায়িত্বে চালিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত"।** তাঁরা বলেন, আমাদের প্রধান ভাবনা হওয়া উচিত সব মানুষের নিকট এবং সমগ্র মানুষের নিকট শুভ সংবাদ প্রচার করা। বিষয়টা শিক্ষাগুরু, প্রবক্তা ও পরিচালক হিসেবে পরিচিত বিশপগণের ভূমিকার উপর জোর দেয়। ভক্তজনগণের জন্য বিশপ ও পুরোহিতগণের অভিষেক গুণে প্রাপ্ত সেবাকর্মের যে বিশেষ দায়িত্ব তা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও একতা স্থাপন। জগতে সমগ্র খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রেরণদায়িত্বকে সেবা করার অধিকার খ্রীষ্ট তাদের প্রদান করেছেন। মণ্ডলীতে, কর্তৃত্বহীন ও উদ্দীপনামূলক সেবকধর্মী নেতৃত্বের মনোভাব নিয়ে সকল অধিকার ও নেতৃত্ব প্রয়োগ হতে হবে, ঠিক যেমন স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে আমাদের প্রভুর জীবনে, যিনি এসেছিলেন সেবা পেতে নয় কিন্তু সেবা করতে (দ্র: মার্ক ১০;৪৫; যোহন ১৩)।

মণ্ডলীতে যখন কিছু মেরুকরণের ঘটনা ঘটে, তখন **একতা নিশ্চিত করা বিশপগণের দায়িত্ব।** 'আমাদের নিকট আশা করা হয়, আমরা যেন একতা ও সমন্বয়ের কেন্দ্র হই, আমাদের পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও ভক্তসাধারণের

জন্য জীবন ও শক্তির উৎস হই, এবং এক প্রৈরিতিক সমাজের সংগঠক হই।' আমাদের প্রশাসনিক কর্তব্যসমূহকে এড়িয়ে না গিয়ে, 'আমরা **আমাদের মেষদের পিতা ও মেষপালক হওয়ার** প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করি, যেন আমরা সত্যি সত্যিই বলতে পারি, 'আমি আমার মেষদের জানি আর মেষগুলো আমাকে জানে। এ উদ্দেশে, সকলের জন্য আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সহজলভ্য হতে হবে আর যাজক, ধর্মব্রতী ও খ্রীষ্টভক্তগণের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।'

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন ("বর্তমান জগতের সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ এবং যারা কোন না কোনভাবে নিপীড়িত, তাদের সকলের আনন্দ ও প্রত্যাশা, দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা খ্রীষ্টানুসারীদেরই আনন্দ ও প্রত্যাশা, দুখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা। যা কিছু প্রকৃত মানবিক, তার কোন কিছুই তাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত না হয়ে পারে না", *বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান,* ১), যেখানে **সকল মানুষের সঙ্গে খ্রীষ্টভক্তদের সংহতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে**। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, তারা আরও বলেন, 'আমরা যারা খ্রীষ্টের সেবাকর্মী ও তাঁর মণ্ডলীর সেবক-নেতা... আমাদের অবশ্যই এদেশে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে গভীর সংহতি-ভাবনা হৃদয়ে পোষণ করতে হবে। এ দেশের সকল মানুষের জন্য আমরা পরিত্রাণ-বার্তার বাহকস্বরূপ..., তাই আমাদের গুরুত্বারোপের বিষয় হচ্ছে প্রেমের সংস্কৃতি দ্বারা রূপান্তরিত এক নতুন সমাজের আগমন।' **বিশপগণের প্রেরণদায়িত্ব এমনকি সকল ধর্মের ও বিশ্বদর্শনের মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত।**

২০০০ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ মণ্ডলীতে তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত নিজেদের ভাবনাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন : 'আপনাদের পালক হিসেবে আমরা... খ্রীষ্টের শিষ্যদের ও তাঁর শুভ বার্তার ধর্মপ্রচারকদের ন্যায় জীবনযাপনে **আপনাদের উজ্জীবিত করার, আপনাদের উৎসাহ যোগানোর এবং আপনাদের সাহায্য করার** মাধ্যমে আপনাদের (সকল খ্রীষ্টানদের) সেবা করার আমাদের অঙ্গীকার নবায়ন করছি। তাঁর এ শুভ বার্তা সমাজের রূপান্তরসাধনে আমাদের উচিত কার্যকরভাবে ঘোষণা করা। খ্রীষ্টীয় সমাজের পরিচালক হিসেবে, বিশপ ও পুরোহিতগণ তাদের ভূমিকাকে নেহায়েত প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সম্পাদক অপেক্ষা খ্রীষ্টভক্তের সেবাকাজ ও প্রৈরিতিক কাজের উদ্দীপনাকারী হিসেবে বুঝবেন।'

তাদের খ্রীষ্টীয় সমাজগুলিকে সঙ্গে নিয়ে, বিশপ ও পুরোহিতগণ অবশ্যই মুক্তির অপেক্ষায় থাকা জগতের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশু-শ্রমিকদের ন্যায় যারা নিপীড়িত তাদের সঙ্গে সংহতিতে থাকবেন। **তারা অবশ্যই দরিদ্রদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করবেন :** 'আমাদের করণীয় হবে দরিদ্রদের জন্য সহজলভ্য হওয়া, তাদের পরিদর্শন করা, তারাও যে অবিচ্ছিন্ন এমন ধারণা লোকদের যোগানো, এবং তাদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের একাত্ম করে তোলা।' ঠিক এ কাজটিই যীশু করেছিলেন। বিশপ ও পুরোহিতগণের আরও করণীয় হবে, দীনহীনদের সম্মান করা, মণ্ডলীর বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ দলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। **এ সবই খ্রীষ্টের উপর, দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারের উপর, এবং দরিদ্রদের সঙ্গে সংলাপ, সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশের উপর বিশপগণের চ্যালেঞ্জপূর্ণ ভাবনার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।**

২। পুরোহিতগণ

বিশপগণ প্রায়শ: পুরোহিতগণের ভূমিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও গঠন সম্পর্কে বলেছেন। যাজকীয় গঠন-গৃহে প্রশিক্ষণের উপর আলোকপাত করে, বিশপগণ ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ করেছেন : 'আমরা আমাদের যাজক-প্রার্থীদেরকে তাদের প্রত্যেকের সামর্থের এবং যে যুগের মধ্যে আমাদের বসবাস সেই যুগের সবচাইতে উপযোগী আধুনিক ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহী। আমরা চাই তারা যেন এ দেশে কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরী থাকে, এ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাদের সমকালীন মানুষের দৈনন্দিন নানা সমস্যা মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত হয়, সামাজিক যোগাযোগের সকল আধুনিক মাধ্যমসমূহের ব্যবহারে দক্ষ হয়। সর্বোপরি আমরা চাই তারা যেন ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণার অধিকারী হয়, **সমগ্র জগতের প্রতি উদারভাবাপন্ন হয়, এবং দরিদ্রদের**

বিভিন্ন চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়।'

বিশপগণ **১৯৮৪** খ্রীষ্টাব্দে আরও বলেছেন : 'খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে সাধারণ পুরুষ ও নারীর গঠন এমন পুরোহিতদের দাবি করে **যারা** এ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের (খ্রীষ্টভক্ত) ভূমিকা বাস্তবায়নে **তাদেরকে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে সক্ষম** : পরিবারে, জীবিকায়, কর্মস্থলে, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যেখানে খ্রীষ্টানদের উপস্থিতি অপরিহার্য হলেও প্রায় ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আমাদের খ্রীষ্টভক্তগণ যদি মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাহলে পুরোহিতগণের প্রশিক্ষণ যে বিষয়টি নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, তারা নেতৃত্বের ধরনসমূহ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করেছেন, যে ধরনগুলো সংশ্লিষ্ট দলগুলোর সঙ্গে লেনদেনে এবং যুবসমাজ, পুরুষ ও নারীর মানব বিকাশের ক্রমবিকাশে একান্ত আবশ্যক। আর তাই **পুরোহিতগণ অবশ্যই অংশগ্রহণধর্মী নেতৃত্বের জন্য এবং পরিচালক হিসেবে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সুশিক্ষিত হবেন।** তারা আরও হবেন **ঐশজনগণের সেবায় বিশপের দক্ষ সহকর্মী।'**

যাজকীয় গঠন বিষয়ক **১৯৮৯** খ্রীষ্টাব্দের এক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'দেশের বিশেষ পরিস্থিতি গঠনের প্রচলিত দিকগুলো অপেক্ষা অন্যান্য দিক দাবি করে। বিশ্বের মহান মহান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আমাদের বসবাস। আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে, এখানে দরিদ্রতা ও অন্যায্যতা ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। এখানে এমন অনেক অঞ্চলে কাথলিকদের সংখ্যা এত অল্প যে, খ্রীষ্টীয় সমাজের নির্মাতা হিসেবে একজন পুরোহিত এ সকল জায়গায় কাজ করতে পারেন না বললেই চলে। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে, পুরোহিত মানব সমাজের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবেন, এ সমাজকে ঐশরাজ্যের মূল্যবোধগুলো অর্জনে, তাদের মধ্যকার জাত ও শ্রেণী বৈষম্যগুলো দূরীকরণে আর এইভাবে প্রেম ও ন্যায্যতার একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবেন। যাজকীয় সেবাকার্য হিসেবে এ সকল কাজকে অবশ্যই স্বীকৃতি পেতে হবে। যাজকীয় গঠন ও ধর্মতত্ত্বীয় প্রশিক্ষণে এ ধরনের সেবাকাজের

বাক্স নং ৮/১

আজকের যাজকীয় সেবাকাজ

(২০০০ খ্রীঃ ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিবৃতি থেকে নেওয়া অংশবিশেষ)

নবধারার মণ্ডলীর দাবি নবধারার পুরোহিত...। ভারতীয় জনগণ পুরোহিতদের ঈশ্বরের মানুষ বলে বিবেচনা করে। খ্রীষ্টকে ঘিরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একজন পুরোহিতকে পরিত্রাণের শুভ বার্তা সকল মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য তাগিদ দেয়...। একজন পুরোহিত বাণীর বিষয়ে সাক্ষ্যদান ও এ বাণীর প্রকাশ্য ঘোষণার জন্য সক্রিয় খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করেন।

পুরোহিত জনগণকে ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর সেবা করার দিকে চালিত করেন। নবধারার পুরোহিত ব্যবস্থার দাবি হল, তিনি খ্রীষ্টভক্তগণকে মণ্ডলীর জীবনের সঙ্গে আর এ মণ্ডলীর বাণীপ্রচারের প্রেরণদায়িত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবেন। সুতরাং, পুরোহিতগণ ভক্তসাধারণের মানোন্নয়নে অংশগ্রহণধর্মী কাঠামোসমূহ সহজ করে তুলবেন এবং তাদের স্ব স্ব আত্মিক দান অনুসারে নেতৃত্বের জন্য ভক্তসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবেন।

নানা কষ্ট, ব্যর্থতা, হতাশা ও একাকীত্বের সময় প্রয়োজন পুরোহিতদের বুঝা, সমর্থন যোগানো ও উৎসাহিত করা। একজন বিশপ তাঁর প্রাপ্তিসাধ্যতা ও শ্রবণের মধ্য দিয়ে, তার ভালবাসাপূর্ণ ও পিতৃসুলভ ভাবনা প্রকাশ করবেন আর তিনি পুরোহিতদের, তারা যা, সে হিসেবেই গ্রহণ করবেন। ধর্মপ্রদেশ ও যাজক-সংঘের পুরোহিতদের মধ্যে সুহৃদ সম্পর্ক ও মিলন পুরোহিতদের জন্য সেবাকাজে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করবে। আরও দরকারী হল বিশপ ও পুরোহিতদের মধ্যে, এবং পুরোহিতদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে সহজতর করে তোলার জন্য যেন অনেক কাঠামো থাকে।

নবধারার পুরোহিত ব্যবস্থা দাবি করে একটি নতুন গঠন – একটি সুসম্পূর্ণ গঠন, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক, মানবীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পালকীয় দিকগুলো সুসমন্বিত থাকবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পুরোহিতগণ পারস্পরিক সম্পর্কের একটি কৌশল রপ্ত করবেন। গঠন হবে প্রাসঙ্গিক। পুরোহিতগণ কিভাবে নিকটবর্তী এলাকার অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, তা শিখবেন। আজকে নবধারার পুরোহিত ব্যবস্থার সকল চ্যালেঞ্জ ও দাবি-দাওয়ার মুখে পুরোহিতগণের চলমান গঠন অপরিহার্য। 'নব' বাণীপ্রচারে প্রয়োজন 'নব' বাণীপ্রচারক। নতুন সহস্রাব্দের একজন পুরোহিত খ্রীষ্টের বিকল্প (অপর খ্রীষ্ট) আর এইভাবে ঐশরাজ্যের শুভ বার্তার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হওয়ার জন্য আহূত।

ফলাফলকে যেন কোনভাবেই অবমূল্যায়ন করা না হয়।’

বিশপগণ ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ করেছেন যে, বহুত্ববাদী এবং দরিদ্রতা বা অন্যায্যতা জর্জরিত পরিস্থিতিতে, **পুরোহিতগণ অবশ্যই সকল মানুষের জন্য তাদের যাজকীয় সেবাকাজের অনুশীলন ঘটাবেন,** আর এই সেবাকাজের সামাজিক দিকের উপর জোর দেবেন। (*পুরোহিতগণের সামাজিক সেবাকাজ বিষয়ক এই অধ্যায়ের ৪ নং বাক্সটি দেখুন*)। পুরোহিতগণ অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জপূর্ণ দর্শনকে তাদের সেবাকাজ ও মনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন আর ঐশতত্ত্ববিদগণ এর ফলাফলগুলো গভীরভাবে নিরীক্ষণ করবেন। **এ কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জপূর্ণ, প্রেরণা সঞ্চারকারী, এমনকি উদ্দীপনামূলক !**

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ পুরোহিতগণের সার্বজনীন প্রেরণদায়িত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই নবধারার মণ্ডলীতে পালনের জন্য বিশপ, পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রভুর কাছ থেকে লাভ করা প্রেরণদায়িত্বের গুণে, তাদের কর্তব্য হল, তাদের অঞ্চলের সকল মানুষের নিকট, বিশেষ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের নিকট, শুভ সংবাদ ঘোষণা করা। তারা অটল থাকবেন নিস্তার রহস্যে, যা তারা মণ্ডলীর ও জগতের নবায়নের জন্য উদ্‌যাপন করেন। নবধারার মণ্ডলী থাকলে, নবধারার পুরোহিতও অবশ্যই থাকবেন। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, যিনি সকল মানুষের জন্য মণ্ডলী আর সর্বোপরি দরিদ্রদের মণ্ডলী সম্পর্কে বলেছিলেন, তাঁকে উদ্ধৃত করে বিশপগণ বলেছেন : মণ্ডলীর মত, পুরোহিতগণকে (ও বিশপগণকে) অবশ্যই সকল মানুষের জন্য পুরোহিত এবং দরিদ্রদের জন্য পুরোহিত হতে হবে !

৩। ধর্মব্রতীগণ

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ ধর্মব্রতীদের সহযোগিতা এবং মণ্ডলীতে তাদের সেবাকাজকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছেন। তথাপি, তারা প্রয়োজন অনুভব করেছেন **অধিকতর সহযোগিতা ও যৌথ পরিকল্পনার,** তবে তা হবে বিধিসম্মত স্বাধীনতার নামে কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই, যার লক্ষ্য কর্মীদের অমিত সম্ভাবনার ও

বাক্স নং ৮/২

বিশপ ও পুরোহিতগণের সামনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

যে দর্শন সম্পর্কে ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (CBCI) এবং ভারতীয় কাথলিক বিশপগণের সম্মেলন (CCBI) বলেছেন সেই দর্শন অনুসারে বিশপ ও পুরোহিতগণ কিভাবে জীবনযাপন করতে পারেন ? তারা কিভাবে সেবক-পরিচালক এবং উদ্দীপনাকার হতে পারেন, যারা ভক্তসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেন ? কিভাবে তারা সত্যিকার অর্থে, যীশুর অনুসরণ করতে আর অগ্রাধিকারভিত্তিতে দরিদ্রদের সঙ্গ দিতে, তাদের সঙ্গে মিশতে, এমনকি তাদের বন্ধু হতে, তাদের সেবাকাজে তাদেরকে প্রাধান্য দিতে, এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে পারেন ? কিভাবে তারা সকল মানুষের জন্য পুরোহিত এবং দরিদ্রদের জন্য পুরোহিত হতে পারেন ? আরও রয়েছে অনেক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ !

তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে তারা সি বি সি আই ও সি আর আই নিয়ে গঠন করেছেন একটি যৌথ কমিটি।

তাদের বিভিন্ন সাধারণ বিবৃতিতে ধর্মব্রতীদের সম্পর্কে প্রায়শ বলার সময়, বিশপগণ খুব কমই তাদের সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলেছেন। তবে তারা ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন : ধর্মব্রতীগণ ঐশরাজ্যের প্রবক্তা হিসেবে মণ্ডলীতে তাদের ভূমিকাকে দেখবেন তাদের নিজ নিজ আত্মিক দান অনুযায়ী স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বে পুরোপুরি নিয়োজিত হিসেবে। অল্প কয়েকটি ঘটনায়, বিশপগণ এ সকল ধর্মব্রতীদের, বিশেষ করে নারী ধর্মব্রতীদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এইভাবে বিশপগণ আজকের জগতে ধর্মব্রতীদের জীবন ও প্রেরণদায়িত্ব ব্যাখ্যা করার কাজ সি আর আই-র হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

৪। সাধারণ খ্রীস্টভক্তগণ

ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর **প্রধান প্রধান ভাবনা ও সর্বাপেক্ষা অতি পরিচিত মূলসুরগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, ভক্তসাধারণের ভূমিকা ও গঠন ।**

বাস্তবিকপক্ষে, সকল বিশ্বাসীবর্গের ভাবনা নিয়েই মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণদায়িত্ব। যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং আমাদের মাতৃভূমিতে তাঁকে উপস্থিত করার জন্য সকলেই আহূত। কাজেই, তাদের আহ্বানকে ঘিরে ভক্তসাধারণের সচেতনতা, তাদের একত্বের অনুভূতি এবং তাদের সেবা, দায়িত্ব ও ত্যাগস্বীকার বোধ, এ সকলকে অবশ্যই শক্তিশালী করে তোলা দরকার। ভক্তসাধারণকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

মণ্ডলী ও সমাজ জীবনে ভক্তসাধারণের গুরুত্বের উপর বিশপগণ বারংবার জোর দিয়েছেন : 'একই দেশ বা সমাজভুক্ত হওয়ার দরুণ, খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে সাধারণ জনগণ তাদের পরিমণ্ডলের নানা সমস্যা ও আশার সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করে। তাদের "প্রধান দায়িত্ব হল, খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করা, এবং তা তাদের জীবন ও কথার মাধ্যমে পরিবারে, তাদের সামাজিক দলে ও তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে পালন করা কর্তব্য" (মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, ২১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়, আমরা আমাদের খ্রীষ্টভক্তদের রাজনীতি, প্রশাসনিক কার্যক্রম, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এ রকম আরও অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, যেখানে তারা শুধুমাত্র আইন প্রণয়নেই অংশগ্রহণ নয়, পাশাপাশি এ সকল আইনের প্রয়োগও নিশ্চিত করতে পারবে।'

পরিবার জীবনকে শক্তিশালীকরণের দায়িত্ব সর্বপ্রথমত, ভক্তসাধারণের। এ বিষয়ে মহাসভার শিক্ষা হল এই যে, খ্রীষ্টীয় দম্পতিরা তাদের জীবনাহ্বান ও জীবনযাত্রা অনুযায়ী বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন (দ্র: খ্রীষ্টমণ্ডলী ১১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)। তাদের পরামর্শ দেওয়া হয় বিভিন্ন সংঘ গড়ে তোলার এবং 'খ্রীষ্টীয় জীবনধারায় যা প্রায়ই কঠিন, আরো সহজ ও পূর্ণভাবে জীবন ধারণের দায়িত্ব পালন করতে একে অন্যকে সাহায্য করার উদ্দেশে... বন্ধুসুলভ দলে' মিলিত হওয়ার (যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন, ৬, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)।

দরিদ্রতা, অসমতা ও নিপীড়নের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য লোকদের সক্ষম করে তোলার কাজে সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অবশ্যই নিয়োজিত হতে হবে। আমাদের লোকদের মধ্যে এ ধারণা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহে মণ্ডলীর, বিশেষ করে ভক্তসাধারণের, অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে আমাদের প্রয়োজন আমাদের দলগুলোকে সমন্বিত করার। যেমনটি পোপ দ্বিতীয় জন পল জোর দিয়ে বলেছেন, তাই ভক্তসাধারণের যথাযথ গঠন হচ্ছে মণ্ডলীতে সর্বাধিক জরুরী অগ্রাধিকারগুলোর অন্যতম।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনুসারে (*ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ, ২ ও ৭, এবং খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৩৩*), **ভক্তসাধারণের বিশেষ আহ্বান বা কাজ,** কার্যক্রম বা ভূমিকা সম্পাদনের তাদের সুবিধাজনক স্থান, এবং তাদের বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য, এগুলো সবই হচ্ছে জাগতিক ব্যবস্থা, যাকে কখনো কখনো লৌকিক ব্যবস্থা বলেও উল্লেখ করা হয়, তার নবায়নকর্ম। এ নবায়নকর্মের অন্তর্গত হল, সামাজিক ও জনজীবনে সুসমাচারীয় মূল্যবোধগুলোর আনয়ন ঘটানোর ভাবনা এবং সামাজিক কাঠামোসমূহের রূপান্তরসাধনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই রূপান্তরসাধন একটি অনেক বেশী মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে... জাগতিক অবস্থার রূপান্তরসাধন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা–এগুলো ভক্তসাধারণের খ্রীষ্টীয় দায়িত্বেরই অংশবিশেষ, আর এই দায়িত্বকে তারা অবশ্যই সাহস ও অভিপ্রায়যোগে তাদের নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। এর অর্থ, সমসাময়িক সমাজকে একটি প্রেমের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিতকরণ, এবং বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের প্রতি বিশেষ মনোযোগদান।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ ভক্তসাধারণের গঠনের উপর আরও গভীর আলোকপাত করেছেন। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, দেশে আজকের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় ভক্তসাধারণের গঠন কার্যক্রম সন্তোষজনক অবস্থার থেকে বেশ দূরেই। এ গঠন শুধুমাত্র বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে "জ্ঞান প্রদান", অথবা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষার প্রশ্ন নয়। তাদের গঠন অবশ্যই দেশ, অঞ্চল ও এলাকার বাস্তবমুখী বাস্তবতা, বিষয় ও সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এ গঠন তাদের সক্ষম করবে 'যুগলক্ষণগুলো পাঠ করতে, তাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও সম্ভাবনাসমূহ বিমুক্ত করতে। এ গঠন বর্তমান

টিধরম্র (বর্তমান দৃশ্যপট), যার মধ্যে ঈশ্বর পরম বাণীকে জগতের নিকট বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, তার সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করে। অন্য কথায়, এখানে ও এখন আজকের পরিস্থিতিতে কিভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য **ঈশ্বর তাদের নিকট আশা করছেন তা জানতে ভক্তসাধারণকে সক্ষম করে তোলা দরকার, এমনকি এমন কাজ করার জন্য তাদের ক্ষমতা যোগানো উচিৎ।**

এর মানে হল, আমরা গঠনে অনুচিন্তন প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি, আরও জোর দিচ্ছি কিছু করা, কাজ করা এবং সম্পৃক্ত হওয়ার উপর। আমাদের গঠন প্রচেষ্টায় কম শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের প্রতি, এবং যুবসমাজ ও নারীর প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ দেব। আমরা তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থার সঙ্গে মানানসই নতুন নতুন উপায় ও মাধ্যম প্রকাশ করব... তাদের সার্বিক গঠন প্রদানের লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনব। কাজ করার ও সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে গঠনবিষয়ক এই অনুচ্ছেদটি অনেক সামাজিক কর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে কার্যদলে এবং সংগঠন ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর ন্যায্যতা ও মুক্তির লক্ষ্যে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সঙ্গে সংগ্রাম করার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে।

নারী ধর্মব্রতীগণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত নারীদের নিকট গিয়ে তাদের **দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে তাদেরকে বিশ্বাসে গঠন** দান করবেন। দরিদ্র ও অসংগঠিত যুবসমাজ, বিশেষ করে আমাদের গ্রামগুলিতে, নিজেরাই সক্রিয় কর্মী হতে পারে, শুধুমাত্র যদি আমরা তাদের কর্মশক্তি ও আগ্রহ-উদ্দীপনাকে, তাদের গুণ ও মেধাকে বিশ্বাসে গঠনদানের অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহে প্রবাহিত করি। পরিবারগুলোর মাধ্যমেও ফলপ্রসূ বিশ্বাসে গঠনদান প্রদান সম্ভব। পাশাপাশি, প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধে চলতে থাকা দুর্নীতি ও অন্যায্যতার পরিস্থিতিতে, পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে হবে, যেন এগুলো নৈতিক ও সামাজিক সদ্‌গুণাবলীর একটি নার্সারী হিসেবে এবং একটি প্রেমের সংস্কৃতি হিসেবে কাজ করতে পারে। ছেলেমেয়েদের গভীর ন্যায্যতাবোধ, ব্যক্তির প্রতি সম্মান এবং দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসায় গড়ে তুলতে হবে। অপর একটি প্রধান ভাবনার বিষয় হবে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সংলাপের লক্ষ্যে ভক্তসাধারণের গঠন।

বাক্স নং ৮/৩

আপনার কি মনে পড়ে ?

আপনার কি মনে পড়ে, পোপ ষষ্ঠ পল ভক্তসাধারণের উদ্যোগ সম্পর্কে কী বলেছেন ? যদি না মনে পড়ে, তাহলে এক্ষুণি পাঠ করুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ পৃষ্ঠার বাক্সটি। আর আপনার কি বিভিন্ন ধরনের ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক সেবাদায়িত্ব সম্পর্কে জানা আছে যেগুলো ভারতীয় বিশপ সম্মিলনী প্রস্তাব করে ? যদি না, তাহলে দেখুন, অধ্যায় ১১.৩।

পোপ দ্বিতীয় জন পলকে উদ্ধৃত করে, বিশপগণ উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে **সেবা ও নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণে ভক্তসাধারণ একটি বিশেষ অবস্থানে রয়েছে।** এই নেতৃত্ব একমাত্র তখনই বিকশিত হয় যখন একে স্বীকার করে নেওয়া ও উৎসাহ যোগানো হয়। নেতৃত্বদানের ভূমিকার জন্য দলিত ও আদিবাসীদের প্রশিক্ষিত করতে হবে, আর নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে, যেন তারা মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ভূমিকা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারে।

৫। পরিবার

বিশপগণ অধিকন্তু মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় পরিবারের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তারা বলেছেন : আমরা যত বেশী পিতামাতা ও পরিবার-জীবন ভিত্তিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেব, তত বেশী আমরা যুবসমাজের উন্নয়নে সেবাকাজ করব। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারা পরিবারগুলোকে **বিভিন্ন দলের সঙ্গে একযোগে সকল প্রকার অন্যায্যতার দূরীকরণে এবং সাধারণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় কাজ করার** সনির্বন্ধ আহ্বান জানিয়েছেন। আর ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, তারা ঘোষণা করেছেন : মণ্ডলী ও সমাজের প্রথম কোষস্বরূপ পরিবার প্রারম্ভিক বাণীপ্রচার ও ধর্মশিক্ষাদানের জন্য আদর্শ ও অনুকূল; এটাকে আরও বলা চলে সামাজিক ন্যায্যতায়

শিক্ষার প্রধান কর্মী এবং যাজকীয় আহ্বানের 'প্রাথমিক সেমিনারী' *(যাজকীয় গঠন ২, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)*।

বিশপগণের নিকট খ্রীষ্টীয় পরিবার হচ্ছে অনিবার্য নানা কষ্ট-অসুবিধা, সংগ্রাম আর এমনকি টানাপোড়েনের মাঝে একটি বিশ্বাস, প্রেম (যা দাবি করে উদার-মানসিকতা, আত্মদান ও আত্মত্যাগ) ও আশার সমাজ। তারা খ্রীষ্টীয় পরিবারকে উল্লেখ করেছেন 'গৃহ-মণ্ডলী' *(খ্রীষ্ট-মণ্ডলী, ১১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)* বলে। "সমাজের প্রাথমিক জীবন্ত কোষ হবার দায়িত্ব ঈশ্বর কর্তৃক পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্ব সম্পন্ন হবে যদি পরিবার তার সদস্যদের পারস্পরিক স্নেহ-মমতা এবং পারিবারিক প্রার্থনা দ্বারা নিজেকে একটি পবিত্র গৃহ-আবেষ্টনীরূপে উপস্থাপন করে, যদি গোটা পরিবার উপাসনা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, শেষ পর্যন্ত যদি পরিবার অভাবের দরুণ কষ্টভোগী ভাইবোনদের মঙ্গলের জন্য সক্রিয় আতিথেয়তা প্রদান এবং ন্যায্যতা ও অন্যান্য সৎকাজের অনুশীলন করে" *(ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ, ১১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)*।

কোন একটি দেশে মণ্ডলীর উন্নয়ন মূলত: খ্রীষ্টীয় পরিবারের মানসম্পন্নতার উপর নির্ভরশীল, এমনকি যখন পরিবারের অবস্থা যে-কোন সময়কালে সমাজের অবস্থার নির্দেশক হয়। একটি পরিবারে বিশ্বাসে গঠনদান বলতে প্রধানত: বুঝায় ঈশ্বরের নিকট নিশর্ত ব্যক্তিগত আত্মনিবেদন; এ গঠনদানের সঙ্গে আজকের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাণীর পুনর্বার ব্যাখ্যা জড়িত রয়েছে। পরিবারগুলো একতা, মিলন, প্রেম ও সেবার আদর্শ হয়ে ওঠার পাশাপাশি, এগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এবং মণ্ডলীর সংগঠিত প্রৈরিতিক নানা আন্দোলনের মাধ্যমে অপরের জন্য তাদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

বিশপগণ সামাজিক ন্যায্যতার কর্মী হিসেবে খ্রীষ্টীয় পরিবারকে এ বলে অভিহিত করেছেন : 'খ্রীষ্টীয় পরিবার সামাজিক ন্যায়বিচার শিক্ষা ও কাজের আদর্শ কর্মী। তাদের জীবনের একেবারে প্রথম বছরগুলি থেকেই ন্যায্যতার মনোভাব, যা ব্যতীত প্রেম নিষ্ফল ও অসম্ভব, তা দিয়ে খ্রীষ্টীয় পরিবারের ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। যেন তারা খ্রীষ্ট সমর্থিত মূলবোধ এবং তাদের চারপাশের জগতে বিরুদ্ধ-মূল্যবোধ –এ দু'ধরনের মূল্যবোধের মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতির ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারে, সেজন্য দেশে অবাধে চলতে থাকা সামাজিক অবিচারের প্রকৃতি ও মূলগুলোর বিষয়ে সকল সদস্য-সদস্যাদের জ্ঞানলাভ করানো আবশ্যক। একটি ন্যায় ও মানবীয় উপায়ে গৃহ-কর্মচারীদের বিজড়িত করা আর তাদেরকে পরিবারের সত্যিকার সহযোগী ও সদস্য বিবেচনা করা দিয়ে একটি শুভ সূচনার অবতারণা ঘটানো যেতে পারে। সকল পরিবারের নিকট সহজে সমাদৃত সামাজিক ভাবনার অপর একটি দিক হচ্ছে, জাত-পাতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ নামক মন্দতার বিরুদ্ধে লড়াই।'

খ্রীষ্টীয় পরিবারকে অধিকন্তু "এমন একটি স্থানে পরিণত হতে হবে যেখান থেকে মঙ্গলবার্তা প্রচারিত হবে ও বিচ্ছুরিত হবে" *(খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার, ৭১)*। এ পরিবারের কাজ বা ভূমিকা হবে মঙ্গলবাণী ঘোষণা, অর্থাৎ, মানবতার সকল স্তরে শুভ বার্তা পৌঁছে দেওয়া, আর এই বার্তারই সাহায্যে মানবস্বভাবের ভিতর থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে একে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান করা। **সকল খ্রীষ্টীয় পরিবারে এই প্রৈরিতিক দিকটির বিদ্যমান থাকা ও প্রতিভাত হওয়া উচিত**। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিভৃত জীবনযাপন এবং বিভিন্ন রুদ্ধ দল ও সমাজ গঠন

করার মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বাস রক্ষা না ক'রে, এ সকল পরিবার অবশ্যই নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ ও সেবার মনোভাব নিয়ে নিজেদের প্রকাশ করবে।

খ্রীষ্টীয় পরিবারগুলো বিভিন্ন স্তরে এই উন্মুক্ততা ও বন্ধুত্বের মনোভাব দিয়ে শুরু ক'রে, ধীরে ধীরে অ-খ্রীষ্টীয় পরিবার ও ব্যক্তিবর্গের মাঝে খামি হিসেবে নিজেদের প্রমাণিত করবে; এ সকল অ-খ্রীষ্টীয় পরিবার ও ব্যক্তিবর্গকে সুসমাচারীয় মূল্যবোধগুলোর স্বাদ ও এগুলোর জন্য ভালবাসা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে; এই কাজটি প্রথমত: খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রতি খাঁটি সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে হতে হবে... কোন রকম ছাড় দেওয়া ছাড়াই সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসী এই মৌলিক সাক্ষ্যদানের প্রতি আহূত, এ মৌলিক সাক্ষ্যদান হচ্ছে, ইতোমধ্যে একটি মৌন তবে খুবই শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ ঐশরাজ্যের মঙ্গলবার্তার ঘোষণা, বাণীপ্রচারের একটি প্রারম্ভিক ক্রিয়া। এইভাবে পরিবারের মধ্য দিয়ে সমগ্র মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে পারে, তেমনি এটা পারে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে, আর জগতের আলো ও পৃথিবীর লবন হয়ে উঠতে।

৬। যুবসমাজ

সি বি সি আই প্রায়শ: যুবসমাজ সম্পর্কে বলেছেন অথবা তাদের উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ বাণী রেখেছেন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ বলেছেন : 'যুবসমাজেরই উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেকের নিকট তরুণসমাজ আজকে গভীর উৎকণ্ঠার কারণ। কিন্তু আমরা বরং **আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আশা** হিসেবে তাদের গণ্য করব। আমাদের যুবসমাজ, যারা নেতৃত্বদানের প্রতি সহজেই সাড়াদায়ী, দায়িত্বশীল জীবনযাপনের জন্য তাদের প্রয়োজন বন্ধুসুলভ পরিচালনা। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে আমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। নবীকৃত আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে আমরা অবশ্যই তাদেরকে প্রশিক্ষণে নিজেদের নিবেদন করব। আমাদের পরিচালনার বাইরে প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শিক্ষালাভকারীদের সংখ্যাও অগণিত। আমরা অবশ্যই তাদের প্রতি যোগ্যতাসম্পন্ন উপদেষ্টা এবং দক্ষ ধর্মযাজকের সেবা বাড়িয়ে দেব। যুবসমাজের এখনো বড় একটা অংশ ছাত্র-ছাত্রী নয়। বিভিন্ন ফার্মে, কল-কারখানায় এবং অফিসে কর্মরত এ সকল তরুণ-তরুণী আমাদের তরফ থেকে যে বিশেষ মনোযোগলাভের চেষ্টায় রয়েছে, তা তাদের পাওয়া উচিত। আজকের তরুণসমাজের অনন্য অবদানের কথা স্মরণে রেখে, আমরা তাদের জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠটি দেওয়ার চেষ্টা করব।'

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ দেশের সমগ্র যুবসমাজের উদ্দেশে বলেছেন : 'আমরা কি আমাদের যুবসমাজের নিকট বিশেষ কোন আবেদন জানাতে পারি ? আমরা তাদের আহ্বান জানাই, **একটি ন্যায় জীবনের তরে** নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য, তাদের অমিত শক্তি ও আগ্রহকে, এবং তাদের মহানুভবতা ও আদর্শ **উৎপীড়িত-নিপীড়িতদের সেবায়** নিয়োগ করার জন্য। আজকে যুবসমাজ বিবেচিত হওয়ার মত একটি শক্তি। এই শক্তিকে দুর্নীতি ও লোভের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা দরকার। এ শক্তি যেন মিলন ও প্রেমকে গঠন ও শক্তিশালী করে। এটা যেন ন্যায়, প্রেম, সমৃদ্ধি ও শান্তির এক নতুন দেশ গড়ার মাধ্যমে একটি অহিংস সামাজিক আন্দোলনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয়।'

এ বাণী এমনকি আরও জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। মণ্ডলীতে তাদের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে খ্রীষ্টানদের উদ্দেশে প্রদত্ত হলেও, এটা দেশে যুবসমাজের প্রেরণদায়িত্বকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে : আমাদের দেশের ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের খ্রীষ্টীয় যুবসমাজ একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী; তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে একটি বিশেষ প্রেরণদায়িত্ব। যুবসমাজ তাদের সকল আদর্শ ও মহানুভবতা ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি, তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে, আমাদের দেশীয় মণ্ডলীতে এক নতুন জগতের উপস্থিতি ও আমাদের ভবিষ্যতের সমন (summons) নিশ্চিত করবে। তাদের আহ্বান জানানো যাচ্ছে, তারা যেন সত্য ও সততার বাসনা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনের ভাবনা, এবং নতুন জীবনধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ঝুঁকি–এগুলো সবই খ্রীষ্টীয় সমাজের পরামর্শক্রমে করেন।'

মণ্ডলীর উপর আরও একবার আলোকপাত করে, বিশপগণ বলেছেন : 'যদি আগামীদিনের দেশকে সত্য ও

ন্যায্যতা, স্বাধীনতা ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ হতে হয়, তাহলে তা সম্ভব হবে যুব সমাজের দ্বারা, কেননা আমাদের খ্রীষ্টীয় যুবসমাজ ঐকান্তিকতার সাথে সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নেবে যা তাদের ধর্মবিশ্বাস বর্তমানকালে তাদের উপর ন্যস্ত করে। কেননা খ্রীষ্টেতে তাদের বিশ্বাসই তাদেরকে দেশীয় জনগণকে নিয়ে পরিবার গঠনে তাদের সর্বোত্তম শক্তি ও তাদের জীবন নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করবে। বাণীপ্রচারে তরুণ প্রজন্মও বিরাট সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন তাদের কথা যথাযথভাবে শোনা এবং বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া।'

শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের উদ্দেশে প্রদত্ত ব'লে, এই অংশটি আমাদের সমাজের সংখ্যালঘুত্বের কারণেই অবাস্তবসম্মত শোনায়। এ বাণীকে সার্বজনীন ভাষায় অনূদিত করা হলে, এটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে আর সকল তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ের গভীরে এটা খোদিত থাকা উচিত। তরুণ হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলীর কারণে এবং তাদের ধর্মীয় ও মানবীয় আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার দরুণ, যুবসমাজ সমগ্র সমাজে এবং তাদের নিজেদের পরিমণ্ডলে পরিবর্তন ও আশার কর্মী হয়ে উঠতে পারে। কাজেই, তাদেরকে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করার এবং সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত-গ্রহণ দলের কণ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সকলের জন্য এটা কতই না শুভ সংবাদ !

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ মণ্ডলীতে যুবসমাজের মুখোমুখি হওয়া কষ্ট-অসুবিধার উপর আলোকপাত করেছেন (অনুরূপ কষ্ট-অসুবিধা তাদের পরিবারে ও সমাজেও থাকতে পারে !) : 'মণ্ডলীর তারুণ্যদীপ্ত সদস্য-সদস্যাগণ জনগণের সমস্যার সঙ্গে এবং কার্যমুখী আন্দোলন ও সংঘ-সমিতির সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করতে চায়। তারা প্রচলিত ধারার সংঘ-সমিতিতে আগ্রহী নয়, কেননা এগুলো ধর্মানুরাগমুখী আর জীবনের সমস্যার সঙ্গে কম সম্পর্কযুক্ত।... ভয়, যেমন খ্রীষ্টানদের সম্পৃক্ততা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভয়, ঝুঁকি গ্রহণের ভয়, দ্বন্দ্ব-বিরোধের ভয়, এটা সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত নতুন নতুন আন্দোলনের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। সমাজকর্মীগণ সম্ভবত উল্লেখ করতে পারেন যে, অনেক তরুণ তাদের নিজ পরিমণ্ডলের বাইরে উদার সংগঠনগুলোর প্রতি প্রধানত আকৃষ্ট, আর তারা কথা বলতে পছন্দ করে বিভিন্ন 'নিজেরা করি' দল, সক্রিয় কর্মীদল, গণ-আন্দোলন, ইত্যাদি সম্পর্কে, আরও পছন্দ করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও মুক্তি বিষয়ক তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে। এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কবে বয়স্করা সাড়া দেবেন ?'

কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, বিশপগণ জোর দিয়েছেন যুবসমাজের গঠনের উপর, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসংগঠিত যুবসমাজের গঠনের উপর, যারাও উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে বিশপগণ খ্রীষ্টীয় যুবসমাজের মধ্যে অধিকতর জাগরণ সৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। একদিন তারাও দেশের আপামর যুবসমাজের জাগরণে আনন্দ প্রকাশ করবে। লাতিন আমেরিকার বিশপগণ দরিদ্রদেরকে সমাজ ও মণ্ডলীতে মুক্তি এবং বাণীপ্রচারের প্রধান কর্মী বলে উল্লেখ করেছেন। এক অর্থে, ভারতীয় বিশপগণ উল্লেখ করেছেন যে, **যুবসমাজকে আমাদের দেশে একটি বিশেষ, অনন্য ও অপরিবর্তনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে**। হ্যাঁ, যুবসমাজ স্বভাবগুণে পরিবর্তন ও উন্নয়ন বাসনা করে। কিছু কিছু মূল্যবোধের প্রতি তারা খুবই সংবেদনশীল, যেমন ন্যায্যতা ও সংহতি। **সামাজিক পরিবর্তনের কর্মী এবং তাদের জনপদে আর সাধারণ অর্থে সমাজে প্রবক্তা হয়ে ওঠাই হচ্ছে ,তাদের সুনির্দিষ্ট আহ্বান**।

৭। নারীজাতি

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বে ও সমাজে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদগুলিতে শুভ বার্তা ঘোষণায় **নারীর অনন্য অবদান** সম্পর্কে একটি আগ্রহ-উদ্দীপক, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কম পরিচিত, মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন : 'জনসংখ্যা খাতে নারীর প্রবেশাধিকার রয়েছে, যা যাজকবর্গের (এবং অন্যান্য পুরুষ মানুষদের) আয়ত্তের বাইরে রয়ে গিয়েছে। তারা পারিবারিক সমস্যাদির বিষয়ে তাদের গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধকে জাগ্রত করার, মানবীয় অস্তিত্বের নীতিমালা লালন-পালন করার, শান্তি স্থাপন করার এবং জনগণের

সঙ্গে, বিশেষ করে দরিদ্রদের সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা সহভাগিতা করার তাদের **অনন্য সক্ষমতার** প্রমাণ দিয়েছেন। বিশেষ করে ধর্মব্রতী সিস্টারদের ভূমিকা.... অনেক অঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।' কিন্তু সর্বোচ্চ মূল্যমানের এ ঐশদানগুলো যথেষ্টরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ সর্বোপরি তাদের সামাজিক জীবনে এবং বাড়িতে পুরুষ মানুষের সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্বে আদিবাসী নারীদের অধিকতর স্বাধীনতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আর দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর দাসত্ব-মোচনকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনের উপর তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, নারীর মর্যাদা ও অধিকার দাম্পত্য জীবনে সমান অংশীদার হতে হবে। তবে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ স্বীকার করেছেন যে, খ্রীষ্টীয় সমাজে নারীরা এখনো পূর্ণ সম-অধিকার লাভ করেনি। তাদেরকে তাদের প্রাপ্য স্থান দেওয়া হয়নি। একই সভায়, তারা অঙ্গীকার করে বলেন যে, আমরাও নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে সমর্থন করব।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ নারীর ভূমিকার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন এভাবে : 'পরিবারে ও সমাজে সব ধরনের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে নারীরা যে-সব কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার প্রতি আমরা আমাদের সমর্থন ব্যক্তি করছি। **মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত,** আর এমন অবস্থা বা পরিবেশ রচনা করা উচিত যেন তারা তাদের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মণ্ডলীতে ও সমাজে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।' ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ আরও বলেছেন যে, আমাদের উচিত তাদেরকে এমনভাবে ক্ষমতাপন্ন করে তোলা যেন তারা মণ্ডলী ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ভূমিকাকে বরণ করে নিতে পারেন।

৮। সম্পূরক আলোকপাত

এই অধ্যায়ে মণ্ডলীতে ভূমিকা ও দায়িত্বের বণ্টনকে ঘিরে বিশপগণের বিভিন্ন বিবৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রেরণাধর্মী যে, খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান, তাঁর ঐশরাজ্যের মূল্যবোধগুলোকে আজকের জগতে মূর্ত করে তোলা, সমাজের কাঠামোগুলো রূপান্তরিত করা এবং প্রেম ও ন্যায়ের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা–এগুলোর লক্ষ্যে **ভক্তসাধারণের আহ্বানের উপর, পরিবারের উপর, যুবসমাজের উপর এবং নারীজাতির উপর** বিশপগণ যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার অনুসরণে, বিশপগণ গুরুত্বারোপ করেছেন যে, **জাগতিক অবস্থার নবায়ন ভক্তসাধারণের বিশেষ ভূমিকা** । তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে, বিশপ ও পুরোহিতগণের নিকট আশা করা হয় যেন ভক্তসাধারণের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে, যেন তারা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পাশাপাশি দরিদ্রদের, তাদের অন্যায্যতা ও নিপীড়নের অভিজ্ঞতায়, তাদের মুক্তি সংগ্রামে, পাশে থাকেন। **তাদের নিজস্ব ভূমিকা হল, ভক্তসাধারণকে তাদের আহ্বানের পূর্ণতায় সাহায্য করা, আর তাদেরকে উপযুক্ত গঠন দান করার এবং তাদের উদ্দীপক ও পরিচালক হওয়ার মাধ্যমেই এ কাজটি করা।**

এই প্রেক্ষিতে, স্মরণ করা যুক্তিসঙ্গত যে, পোপ দ্বিতীয় জন পলকে উদ্ধৃত করে বিশপগণ উল্লেখ করেছেন যে, ভক্তসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে সেবা ও নেতৃত্বদানের ভূমিকাকে কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য একটি বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বসবাসের সময় ভক্তসাধারণ অবশ্যই অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং ধর্মগুলোর মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করবে।

ঘটনা যাই হোক, দু'টি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হওয়া দরকার। 'স্বতন্ত্র' হোক বা না হোক, অথবা যে মাত্রায়ই হোক, সমাজের মঙ্গল এবং মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের সম্পন্নতার জন্য **ভক্তসাধারণের আহ্বান ও অংশগ্রহণ সন্দেহাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।** সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের জন্য এটা একটি মৌলিক অধিকার এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, তাদের বিশ্বাসের একটি প্রকাশ। পোপ ষষ্ঠ পল যেমনটি গুরুত্বারোপ করেছেন, সুতরাং ভক্তসাধারণ "আদেশের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষায় না

থেকে" "স্বাধীনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে"। অপরদিকে, বিশপ ও পুরোহিতগণকেও অবশ্যই সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ ক'রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে (*দ্র: বক্স নং ৪*)।

সময়ের ধারায়, ভক্তসাধারণের প্রাবক্তিক, সংস্কারীয় ও পালকীয় কাজ এবং এবং বিশপ ও পুরোহিতগণের প্রাবক্তিক, সংস্কারীয় ও পালকীয় কাজের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও উল্লেখ করা দরকার। যে-কোন ঘটনায়, এ কাজটি অবশ্যই বাস্তব পরিণতিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই করা দরকার। মণ্ডলীর সামাজিক প্রেরণদায়িত্ব বিষয়ক বিশপগণের বিবৃতিগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সেবাকাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা প্রায়শ "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করলেও, তারা কিন্তু এই প্রেরণদায়িত্বে বিশপ ও পুরোহিতগণের সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। এই বিষয়ে তারা খুব অস্পষ্ট থেকে গিয়েছেন। এখানে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে, তার অর্থ বুঝতে হলে, একজনকে শুধুমাত্র বাণীপ্রচার ও সামাজিক মঙ্গলসমাচার বিষয়ক এবং দরিদ্র ও প্রান্তসীমার জনগণের সঙ্গে সংলাপ বিষয়ক বিশপগণের ঘোষণাপত্রগুলো পাঠ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, বিশপগণ যখন 'মণ্ডলী' সম্পর্কে বলেছেন (*দ্র: অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৪২ পৃষ্ঠা*), তখন কাদের কথা মাথায় রেখে তারা এ কথাগুলি বলেছেন, **পুরোহিত অথবা ভক্তসাধারণ, নাকি উভয়ের কথা বলেছেন।** বিষয়টা অনেক স্পষ্ট, আর অনেক অনুপ্রেরণাধর্মী ও মনোহর হত, যদি তারা বলতেন, 'বিশপ ও পুরোহিতগণ দরিদ্রদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করবেন'; তারা তাদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় ও মুক্তির সংগ্রামে তাদের পাশে পাশে থাকবেন'। অথবা যদি তারা বলতেন, 'পুরোহিত ও ভক্তসাধারণ উভয় পক্ষই...'। এর আগের পৃষ্ঠায় (*অর্থাৎ ৫ অধ্যায়ের ৪১ পৃষ্ঠায়*) তারা 'আমরা' কথাটির উল্লেখ করেছেন। যারা আহূত হয়েছে ঠিক মোশীরই মত শোষণ-নির্যাতন থেকে দরিদ্রদের মুক্ত করার জন্য, তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য এবং তাদের ক্ষমতাপন্ন করার জন্য, এই 'আমরা' কারা?

মণ্ডলীকে সর্বোপরি আলোকপাত করতে হবে

বাক্স নং ৮/৪

পুরোহিতগণের সামাজিক সেবাদায়িত্ব

এ আলোচনার আলোকে, ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক পোপীয় কমিশনের (PCJP) নীচের অনুচ্ছেদটি ভেবে দেখার জন্য সহায়কস্বরূপ। এ কথা সত্য যে, জাগতিক অবস্থার নবায়ন এবং মানবাধিকার 'বিশেষ অর্থে ভক্তসাধারণেরই কাজ'। 'তথাপি, পুরোহিত ও ধর্মব্রতী পুরুষ ও নারীগণ, জাগতিক সমাজের নাগরিক হিসেবে তাদের ক্ষমতায় এবং তাদের পালকীয় প্রেরণদায়িত্বের পূর্ণতাসাধনে, মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় আহূত হয়েছেন। এই কারণে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের বিশপগণের সিনডে ঘোষণা করা হয়েছে .... 'প্রশ্নটা যখন মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার, ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতিসাধনের এবং শান্তি ও ন্যায্যতার কারণের অনুসরণের, তখন সমগ্র মণ্ডলীর সঙ্গে একসাথে পুরোহিতগণ, তাদের সামর্থের শেষবিন্দু পর্যন্ত, একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।'

সন্দেহাতীতভাবে, বিশপদের বেলায়ও এটা সত্য। এ কারণে সি সি বি আই অযোধ্যা ও গুজরাট ঘটনার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান করেছিল। সুতরাং, সার্বিক ভারতীয় পরিস্থিতি এটা বুঝতে ও ঘোষণা করতে আমাদের কি বাধ্য করে না যে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আজকে আমাদের দেশের পুরোহিতদের জন্য "প্রেরণদায়িত্বের ও প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারের একটি বিশেষ রূপ"। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা বহুসংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রীষ্টভক্তগণকে নিবেদিত করতে চেয়েছিলেন, যারা একটি সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ দেশের জনগণের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। আর তারা এমনকি ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বীকার করেছেন যে, 'আমরা যারা বিশপ আমাদের নিকট জগগণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশা করেন আমরা যেন একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দান করি।' সকলকেই সম্পৃক্ত হতে হবে।

সামাজিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন দিকের উপর। সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ জাগতিক বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকলেও, বিশপগণের (ও পুরোহিতবর্গের) মধ্যস্থতার উপর প্রায়শ: অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। একজন বিশপ বা পুরোহিতের পরিচালনায় একটি প্রতিবাদ মিছিলে জনগণ কি বেশী মনোযোগ দিত না – যদি না একজন মহাত্মা গান্ধী সম্পৃক্ত

থাকতেন ? বিশপগণের পদমর্যাদার কারণে, আরও কঠিন হচ্ছে তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া, জেলে পুরা বা হত্যা করা।

লোকদের তাদের অধিকারের জন্য সংগঠিত ও পরিচালনার পর্যায়ে, বিশপ ও পুরোহিতগণের সঠিক ভূমিকাটি কী ? মণ্ডলী কিভাবে তার সামাজিক প্রেরণদায়িত্ব দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে, যদি বিশপগণের সরাসরি অংশগ্রহণ না ঘটে? বিশপগণ কিভাবে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের পরিচালনা, নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণ/গঠন দান করবেন, যদি জনগণের সংগ্রামে তাদের অন্ততপক্ষে কিছু সরাসরি অংশগ্রহণ না ঘটে ? বিশপগণ দরিদ্র ও কর্মীদের সঙ্গে কিভাবে সংহতি প্রকাশ করবেন, যদি তারা অসুবিধা ও টানাপোড়েনের মুখে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেন ?

ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকার এবং তফশিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের রক্ষায় বিশপ ও পুরোহিতগণ যদি জনগণের বিক্ষোভ ও আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন, তাহলে কেন তারা অনুরূপ কাজ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে, হোক তা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক, করতে পারেন না ? নাকি বিশপ ও পুরোহিতগণের ভূমিকা নীতিমালা ও মূল্যবোধসমূহের ঘোষণা এবং অন্যায়ের প্রাবক্তিক প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? তাদের নেতৃত্বদানের ভূমিকা কি এই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ? তাদের এ ভূমিকা কি জনগণের আন্দোলন, সংগঠন, কার্যক্রম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রকে বাতিল ঘোষণা করে ? এটা ঠিক যে, এ ধরনের সম্পৃক্ততায় বিশপ ও পুরোহিতগণেরও রয়েছে কিছু পিছুটান।... তবে **যাজক ও খ্রীষ্টভক্তের নিজ নিজ ভূমিকার উপর অনেক বেশী আলোকপাত প্রয়োজন। বিদ্যমান ধারণাগুলোর বাস্তব পরিণতি ও প্রয়োগ অন্ততপক্ষে ব্যাখ্যা করা দরকার।**

বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবাদে বিশ্বাসী লোকদের জন্য এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা কী ? যদি এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা হয় যে, বিশপগণের বিবৃতিগুলো শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের নিয়েই নয়, কিন্তু অনেক সময় সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই, তাহলে এগুলো অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক হবে। তবে এ বিবৃতিগুলো সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, কিন্তু এ সকল বিবৃতিতে খ্রীষ্টীয় পারিভাষিক শব্দাবলীর কারণে কাজটি কঠিন। তথাপি, বিশপগণ আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে, সকল ধর্মীয় ও লৌকিক মানবতাবাদীদের আহ্বান হচ্ছে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান। বিভিন্ন উপায়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তারা আমাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। জনগণের নানা সংগ্রামেও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও কাজ, আর সকলেরই উচিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করা। তবে নেতৃত্বদানের ন্যায় বিষয়গুলো অনেক সময় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সমর্থনের ভিত্তিতে সমাধা করা হয়। লোকদের প্রশিক্ষণদান, সচেতনকরণ ও সংগঠিতকরণের গুরুত্বও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালক, সদস্য, নারী ও যুবসমাজের গুণাবলী, দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকারের উপর বিশপগণের আলোকপাতও অনেক প্রাসঙ্গিক।

এই অধ্যায় শেষ হবে **'আজকে মণ্ডলীতে নেতৃত্বদান'** বিষয়ক বিশপ গালি বালির একটি আলোকধর্মী বিষয় দিয়ে। যীশুর নেতৃত্বদান যেহেতু ছিল প্রাসঙ্গিক, প্রাবক্তিক, বিরোধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার, নির্যাতিতদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার, তাই বলা যায় তাঁর এ নেতৃত্ব ছিল মুক্তিমূলক নেতৃত্ব। খ্রীষ্টীয় নেতৃত্বদানকে অবশ্যই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। নিজের পদমর্যাদা ও ভূমিকা যা-ই হোক, প্রত্যেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে অবশ্যই আজকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় (আর সেই সঙ্গে দুর্নীতির বাস্তবতায়) নেতৃত্বের অনুশীলন ঘটাতে হবে। মণ্ডলীকে অবশ্যই দেশে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলোর প্রতি কার্যকরভাবে সাড়া দিতে হবে ... আর তা করতে হবে ধীরে ধীরে বেসামরিক স্থান দখল এবং প্রাবক্তিক ভূমিকা সম্পাদনের মাধ্যমে। **আজকে, সমাজে বিভিন্ন বিষয় ও চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়াদানে পক্ষ সমর্থন একটি শক্তিশালী পদ্ধতি ও মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।** পক্ষ সমর্থনে বিশপগণের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর তারা অবশ্যই এ বিষয়টিকে একটি পালকীয় অগ্রাধিকাররূপে গ্রহণ করবেন। এই কার্যক্রম অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উপায়ে প্রকাশ করতে হবে আর এতে সকল খ্রীষ্টানের অবশ্যই অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

অধ্যায় ৯

মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামাজিক সেবাকাজ

বিশপগণ কখনো কখনো সাধারণভাবে মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (১), শিক্ষা(২), স্বাস্থ্য(৩) ও সামাজিক খাতে এ মণ্ডলীর প্রেরিতিক কাজ(৪) সম্পর্কে কথা বলেছেন। এইভাবে, তারা কিছু প্রাসঙ্গিক তবে সাধারণ দিকনির্দেশাবলীর প্রস্তাব করেছেন। **তারপরও, মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা যোগানোর এবং জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সত্যিকার অর্থে প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে এখনো অনেক পুনঃচিন্তাভাবনা (ও কাজ) রয়েছে, যেগুলো করা দরকার**। বিশপগণের আলোকপাতগুলো নিয়ে আলোচনা করার পর, শেষে যে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা হবে, তা হল আবশ্যিক দিকনির্দেশনার লক্ষ্যে যা প্রয়োজন (৫)।

১। মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

বিশপগণ মাঝে-মধ্যে দেশের জন্য, বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীগুলোর জন্য মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর আলোকপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তারা বলেছেন : 'শিক্ষা, কল্যাণ, চিকিৎসা সেবা, ইত্যাদি খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংখ্যায় অনেক এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অসংখ্য মানুষের জন্য মণ্ডলী নিরতিশয় বাস্তব অর্থে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহ ও নবায়নকারী ক্ষমতার চিহ্ন হয়ে উঠেছে। আর ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা বলেছেন : শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নয়ন কাজে মণ্ডলী আন্তরিকভাবে নিয়োজিত আর এ সকল খাতে তার অবদানকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ খ্রীষ্টীয় অবদানকে পর্যালোচনা করেছেন এভাবে : 'এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে দুর্বল শ্রেণীগুলোর ভাই ও বোনদের শিক্ষাগত, আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়নে মণ্ডলী প্রচুর কাজ করেছে, আর এইভাবে সে এর সামাজিক ও অন্যান্য সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষায় খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। জাতি গঠনে বিশেষ করে নারী শিক্ষা হচ্ছে এ মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান অবদান। তবে এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি তা অপর্যাপ্ত।'

বিশপগণ সর্বোপরি মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক নির্দেশনার উপর তাদের ইচ্ছার সহভাগিতা করেছেন। তাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইচ্ছাটি হচ্ছে, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের : **'আমাদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করা দরকার, যেন এগুলো একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠার মণ্ডলীর ইচ্ছার খাঁটি সাক্ষী আর এইভাবে, সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।** মণ্ডলী তার নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে, এমনকি এর চেয়েও বেশী, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে নিজেকে বিজড়িত ক'রে একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে।

বিশপগণের বিবৃতিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখাটা হবে জ্ঞানদীপ্ত, তবে তাদের ভাবনাগুলো অনেক সার্বজনীন। অন্যান্য অনেক দিকের পাশাপাশি, মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলো মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ এগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সেবার জন্য নিবেদিত। আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ঈশ্বর-ও-মানুষ অভিমুখী হবে, আর দক্ষতা ও সফলতার উর্ধ্বে উঠে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। পাশাপাশি, এগুলো আমাদের ব্যক্তিত্ববিহীন হয়ে পড়াকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত 'স্বচ্ছ

প্রশাসনের কৃতিত্ব উপভোগ করা" এবং নিজের নিকট রক্ষিত মাধ্যমসমূহের সাহায্যে এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সঙ্গে সহযোগিতায় নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বিস্তার ঘটানো। উপরে যা বলা হল, তা অবশ্যই ন্যায্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর মাধ্যম হবে। এগুলো অবশ্যই সুসমাচারীয় মূল্যবোধ অনুসারে পরিচালিত হবে, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে, এবং এইভাবে ন্যায্যতা ও সততার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হয়ে উঠবে।

শেষে বিশপগণ গুরুত্বারোপ করেছেন কিছু নীতি বিষয়ক নির্দেশাবলীর উপর : '(১) আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকার্য উত্তরোত্তর দরিদ্রদের চাহিদা পূরণ করবে আর এগুলিতে দলিত ও আদিবাসীদের জন্য প্রবেশ ও চাকরি উভয় ক্ষেত্রে আসন-সংরক্ষিত থাকবে। (২) প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত ধর্মপ্রদেশীয় ও ব্রতীয় জীবনের কর্মীগণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অনুকূলে, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য অগ্রধিকারভিত্তিক ভালবাসার একটি চিহ্ন হিসেবে, একটি স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করবেন। (৩) আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর থাকবে কর্মীদের চাকরির শর্তাবলীর বিষয়ে ন্যায়বিচার অনুশীলনের সুখ্যাতি। (৪) ধর্মপ্রদেশের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো শান্তি, সম্প্রীতি, ও মানবাধিকারের জন্য আন্তধর্মীয় সংলাপকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (৫) আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত মূল্যায়ন করব, যেন এগুলো ন্যায্যতার সাক্ষী এবং সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেমের পক্ষে সাক্ষ্যদানের এগুলো তাদের প্রেরণদায়িত্ব পূরণ করছে কি-না, তা যাচাই করে দেখার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই একটি আত্ম-অনুসন্ধান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। **এমন কাজ একটি সাধারণ দর্শন এবং একটি কর্ম-পরিকল্পনার জন্য কিছু সহায়ক দিক সরবরাহ করে বটে, কিন্তু মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে একটি স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার যোগান দেওয়াটাই কি যথেষ্ট ? আর এ সকল নীতিমালা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে ?**

২। শিক্ষা

এখন আমরা বিশপণের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান প্রধান বিবৃতিগুলো আলোচনা করব, উদ্দেশ্য হল তাদের ভাবনাসমূহ ও যে সকল বিষয়ের উপর তারা গুরুত্বারোপ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা। তারা **১৯৬৬** খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন : কারিগরী বিদ্যালয়গুলোর উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে, এবং আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আত্মনিবেদনের নবীকৃত মনোভাব নিয়ে, আমরা দেশের যুবসমাজের অধিকতর সেবায় আসার আশা পোষণ করি। আবার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন : আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবেশীর **সেবা এবং** সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীগুলোর জন্য **ভাবনার কেন্দ্রপীঠ** করে তোলার ক্ষেত্রে আমরা সচেষ্ট হব।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ উল্লেখ করেছেন : 'সরকার ও তার পরিষদবর্গের নিকট এটা বোধগম্য যে, **শিক্ষা ব্যবস্থার শুধুমাত্র উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন।** কিন্তু এটা অর্জনে যে যে অসুবিধা সেগুলো অজেয়। লোকগণনা উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, এমনকি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুবিধাগুলো শুধুমাত্র নিম্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলোর এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশের নাগালের মধ্যে। আমাদের জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ আনুপাতিক হারে অশিক্ষিত, আবার যারা স্কুল-কলেজে যায় তারা এমন বিধিবৎ শিক্ষা পায়, যা তাদের পরিবেশের কিংবা তাদের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন শিক্ষা উপযুক্ত চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়, আর এটা শিক্ষা দেয় এমনসব কিছু চাইতে, যা তাদের সামর্থের বাইরে। তাই প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারসাধনের মৌলিক পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন।'

এরপর বিশপগণ এ প্রস্তাবগুলো করেছেন : 'মণ্ডলী তার প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধগুলোকে বুদ্ধিজীবি-জগতের নিকট এবং সামগ্রিকভাবে জাতির নিকট উপস্থাপন করতে পারে, বিশেষ করে সুসংহত ও আলোকিত ব্যক্তিত্বদের গঠনদানের মাধ্যমে, যারা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে আর এ সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোর সমাধানে অবদান রাখতে পারবে। মণ্ডলীকে অবশ্যই তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল নীতিমালা পুনঃপরীক্ষা করে দেখা দরকার, যেগুলো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অভিজাতদের বাসনা

পূরণের প্রতি খুব বেশী মনোযোগ দেয়। মণ্ডলী তার শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো অবশ্যই সাক্ষরতা ও শিক্ষার সুফলগুলো নিম্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলোর নিকট এবং গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন নতুন কাঠামোর এবং অনানুষ্ঠানিক নানা পদ্ধতির প্রস্তাব করবে আর এইভাবে সে **ন্যায্যতা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তার মঙ্গলসমাচারীয় প্রেরণদায়িত্বের প্রতি আন্তরিক থাকবে।** অ-শিক্ষার্থী এবং বেকার যুবসমাজকে সমাজে তাদের সঠিক স্থান অধিগ্রহণে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা দরকার।'

বিশপগণ মণ্ডলীর শিক্ষাভিত্তিক অগ্রাধিকারের উপর বলা অব্যাহত রেখেছেন ! 'দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিস্থিতি এবং এক নতুন ও ন্যায় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তরুণ-বয়স্কদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার মণ্ডলীর আহ্বান –এ দু'য়ের সুবাদে, এ মণ্ডলী সর্বশ্রেণীর জনগণের জন্য শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রে স্কুল-বহির্ভূত এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আলোকিত ও নিবেদনপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রধান কাজ হবে। এ শিক্ষায় থাকতে পারে খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে যা সর্বোত্তম তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু, আর এটা হবে বিশেষ করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানিক সমাজ এবং শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কিত দেশীয় শিক্ষার মূল্যবোধগুলোর উপর ভিত্তি করে।'

ন্যায্যতা ও সামাজিক পরিবর্তনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে, বিশপগণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সুপারিশমালাকে আরও সুস্পষ্ট করেছেন : 'আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে যেগুলো সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর চাহিদা পূরণে নিয়োজিত, এগুলোর উচিত সামাজিক পরিবর্তনের কর্মী হয়ে ওঠা এবং বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমের খোঁজ করা, যেগুলোর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে ও কম সুবিধাভোগীদের জন্য ভাবনার উদ্দেশে শিক্ষা দেওয়া যাবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই চেষ্টা করবে আশেপাশের স্কুলগুলোকে সহায়তা প্রদান এবং উপকরণাদি সহভাগিতা করার মাধ্যমে, যে সকল সুযোগ-সুবিধা বা উপকরণাদি বড়লোকদের জন্য সহজপ্রাপ্য সেগুলো দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমানভাবে সহভাগিতা করার লক্ষ্যে তাদেরকে উত্তরোত্তর জড়িত করিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, এবং এই রকম আরও অনেক উপায়ে, তাদের নিকট উপনীত হওয়ার মাধ্যমে। **আমাদের ভবিষ্যত শিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষ্টাগুলো অবশ্যই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক সাক্ষরতার দিকে বেশী বেশী অগ্রসর হবে।** '

বিশপগণ আরও জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঈশ্বরের পরিব্যাপ্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান করে তুলতে হবে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গুরুত্ব পাওয়া উচিত, আর প্রাত্যহিক জীবনে প্রার্থনা ও মঙ্গলসমাচারীয় সাক্ষ্যদানের একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে একাত্ম করার মাধ্যমেই এ শিক্ষা গুরুত্ব লাভ করবে। বিশপগণ ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও উল্লেখ করেছেন যে, ন্যায্যতা, উন্নয়ন ও শান্তি (JDP) বিষয়ক কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা; তার আরও উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিকল্প ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যেন জনগণের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সে লক্ষ্যে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ তাদের প্রস্তাবকে আরও বাস্তবতা দান করেছেন : 'দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ভর্তি নীতিমালা ও প্রশিক্ষণে দরিদ্রদের জন্য মণ্ডলীর অগ্রাধিকার ভাবনার প্রকাশ ঘটানো। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদদের জন্য কার্যকর শিক্ষা ও ধর্মীয় গঠন প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, এর ফলে তারা তরুণ-তরুণীরা যেন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।' ১৯৭৮ ও ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বিবৃতিগুলো অনুসারে, গৃহীত ভর্তি নীতিমালা ও গঠন অবশ্যই সুবিধাবঞ্চিতদের অনুকূলে সমাজ-কর্মীদের গঠনের দিকে চালিত হবে।

তবে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ স্বীকার করেছেন যে, ব্যাপকভিত্তিক নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সকলের জন্য শিক্ষার এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এ পর্যন্ত আমরা যা করতে সক্ষম হয়েছি, তার থেকেও অনেক বেশী। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ ইতোমধ্যে উল্লিখিত আদর্শগুলো অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন : 'মঙ্গলসমাচারের ভাবধারায়, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত হবে

সকলের সঙ্গে তাদের ভাই ও বোন হিসেবে, একই পরম পিতার সন্তানসন্ততির ন্যায় আচরণ করা.. এগুলো মানুষের একই পূর্ণতার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং ভাবনা, ন্যায্যতা, সততা, সম্মান ও প্রেমের জীবন্ত সাক্ষী। সংখ্যালঘু অধিকারগুলো হচ্ছে, সৃজনশীল শিক্ষারই জন্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই নিয়মিত আত্মমূল্যায়ন করবে আর তা করবে পরিবর্তনশীল চাহিদাসমূহের আলোকে, এগুলো সংগ্রাম করে যাবে সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য, তবে একই সময় এগুলো মানব ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার তাদের প্রাথমিক কর্তব্য বহাল রাখবে।'

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা নীতিমালা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, বিশপগণ একটি মহা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুতির অঙ্গীকার করেছেন, যা ছেলেমেয়েদেরকে পরিবার জীবনভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উপায়গুলোর প্রতি, কন্যাশিশু এবং মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের গুরুত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবে। তবে এই পরিকল্পনায় আরও অনেক-কিছুর অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে হবে। সম্ভবতঃ এই মহা পরিকল্পনা এখনো প্রস্তুত করা হয়নি। "কাথলিক শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য মণ্ডলীর ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপনায় গৌহাটির বিশপ আর্চবিশপ টি. মেনামপারামপিল একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেছেন, যার মধ্যে অন্তর্গত থাকবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে একটি ব্যবস্থা, এবং কিছু বাস্তব কৌশল ও ফলমুখী পরিকল্পনা।

উপরোক্ত বিবৃতিগুলোতে রয়েছে কিছু বাস্তবধর্মী শিক্ষামূলক প্রস্তাব : (১) ভর্তি নীতিমালায় দরিদ্রদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের নিকট উপস্থিত হওয়া; (২) শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা; (৩) সামাজিক মূল্যবোধ ও সচেতনতাকে উৎসাহিত করা এবং পরিবর্তনের কর্মী হিসেবে পরিচালকদের গঠনদান করা; (৪) স্কুল বহির্ভূত ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং নতুন নতুন কাঠামো ও বিকল্পধারার পদ্ধতির প্রস্তাব করা; (৫) আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আশেপাশে যারা সুবিধাবঞ্চিত তাদের সেবা করা। সংক্ষেপে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমগুলো অবশ্যই সার্বিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাবে, এবং এগুলোকে সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং শিক্ষাখাতে সংস্কার সাধনের চূড়ান্ত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ দাবি জানিয়েছেন যে, দেশে অন্যায্যতার কাঠামোসমূহ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন তারা এ সকল অন্যায্যতা দূরীকরণে কাজ করে। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, তারা আরও ঘোষণা করেছেন যে, দরিদ্র, দলিত ও আদিবাসীদের আত্মসচেতন, প্রশিক্ষণদান, সংগঠিতকরণ ও ক্ষমতায়নের করার লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আমাদের সামাজিক প্রৈরিতিক কাজে শীর্ষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সকল খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশে বিশপগণের দিকনির্দেশনাগুলো সর্বোপরি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রাসঙ্গিক। পরবর্তী অধ্যায় পাঠ করে আমরা যা জানব, তা হল, বিশপগণের কতকগুলো বাস্তবধর্মী প্রস্তাবনার সর্বোপরি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের শিক্ষাগত ক্ষমতায়ন। সুতরাং, **শিক্ষা বিষয়ক বিশপগণের বিবৃতিগুলো একটি চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ পর্যন্ত তাদের কতগুলো প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে ?**

বিশপ গালি বালির কথা দিয়ে এ পর্ব শেষ করা যায় : দেশীয় মণ্ডলী স্কুল-কলেজসহ শিক্ষাখাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু কতজন ছাত্র-ছাত্রী ইতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং দুর্নীতি, সামাজিক অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ? ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে জেসুইট প্রধান বলেছেন : খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য বাণীপ্রচার কার্য.... অর্থাৎ, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা, ন্যায় ও মিলনের মানব সমাজ গঠন। একেই তো বলে ঐশরাজ্যের প্রকৃত সেবা। এটাই তো হচ্ছে খাঁটি বাণীপ্রচার।

৩। স্বাস্থ্যসেবা

বিশপগণ কদাচিত স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বলেছেন। তথাপি, তাদের প্রস্তাবিত কতকগুলো দিকনির্দেশনা যেমন লক্ষণীয় তেমনি বাস্তবায়নে আদর্শস্বরূপ ! ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে

তারা বলেছেন : আমরা চাই আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের, বিশেষ করে গ্রামের ও শহরাঞ্চলে বস্তির জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় এগিয়ে আসুক। কাথলিক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীগুলো স্বাস্থ্যসেবার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধকের ন্যায় দিকগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করবে। বিশেষ করে, আমরা এগুলোকে আহ্বান জানাই, তাদের কুষ্ঠ দূরীকরণ কার্যক্রমে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য, আর এর সঙ্গে একটি সুপারিশ হচ্ছে এইচ আই ভি-এইডস্ এবং পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তি করে নেওয়ার মাধ্যমে একে হালনাগাদকরণ।

এক নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং এগুলোর নিবেদিত ও দক্ষ সেবা প্রদানকারী কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশপগণ ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দের সাথে স্বীকার করেছেন যে, সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা খাতগুলোর সংখ্যায় বৃদ্ধি ব্যাপক অবদান রেখেছে। সি বি সি আই-র বিবৃতিগুলো স্বাস্থ্যসেবার প্রতি মনোযোগ দেয়নি বললেই চলে। বাস্তবিকপক্ষে এ বিষয়ে তাদের সুপারিশমালাগুলো যেন-তেনভাবে সারা হয়েছে।

৪। সামাজিক প্রৈরিতিক কাজ

আমাদের সামাজিক সেবাখাতগুলোর দিক নির্দেশনা

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সি বি সি আই ভারতীয় মণ্ডলীর অনেক ত্রাণকার্য এবং দীর্ঘমেয়াদী নানা প্রকল্প সম্পর্কে বলেছেন। এই ত্রাণ ও উন্নয়ন কর্মকে বেশ সাধুবাদ জানানো হয়েছে। বিশপগণ Catholic Charities India-র প্রশংসা করেছেন অভাবীদের মাঝে এর সেবাকার্যের জন্য এবং ক্ষুধা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে এর সংগ্রামের জন্য। 'জগতে ক্ষুধা' ছিল অন্যতম মূলসুর, যেটা নিয়ে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোচনা করা হয়। বিশপগণ ক্ষুধার চলমান কশাঘাত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে পীড়াদানকারী এই মন্দের একেবারে কেন্দ্রমূলে আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই সচেতনতা বৃদ্ধির একটি অংশ হিসেবে, তাদের প্রস্তাব হল, আমরা যেন প্রতি শুক্রবার একটি বেলার আহার বাদ দিই এবং যারা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, তাদের সাহায্যার্থে ধর্মপ্রদেশের ব্যয়খাতে সেই বেঁচে যাওয়া অর্থ দান করি। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই প্রস্তাবটি মণ্ডলীতে ব্যাপক সাড়া লাভ করেনি।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, **বিশপগণ মণ্ডলীর ত্রাণ ও উন্নয়ন কাজের দিক নির্দেশনার উপর আলোকপাত করেছেন** : আমাদের মত দেশে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে খরা, বন্যা ও অন্যান্য জরুরী অবস্থা কালে, এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আরও একটি আশু প্রয়োজন হল, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এবং সমাজের দুর্বল ও অবহেলিত শ্রেণীদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। তথাপি খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমাদের উন্নয়নের প্রৈরিতিক কাজ 'একটি কম দয়া প্রদর্শনের কাজ' হয়ে ওঠে এমন একটি কাজ, যা আত্মনির্ভরশীলতা, অংশগ্রহণ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত।

সি বি সি আই-এর বিবৃতিগুলোতে রয়েছে কারিতাস ইণ্ডিয়া এবং মণ্ডলীর সার্বিক সামাজিক সেবাকাজের জন্য কিছু দিকনির্দেশাবলী। এখানে আমাদের স্বার্থে এগুলি একত্রে তুলে ধরা হল।

(১) আমাদের যত উন্নয়ন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে... একটি অনেক বেশী ব্যক্তিমুখী কার্যক্রমের খোঁজ করা এবং পুরাপুরি প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকাজের বিপদের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকা।

(২) এগুলোর দায়িত্ব হবে মানব ও বৈষয়িক সকল সম্ভাব্য সম্পদকে আমাদের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত করা।

(৩) আমাদের সামাজিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ হবে সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো জানা, যেগুলোর নেপথ্য উদ্দেশ্য হল, দুর্বল ও শোষিত শ্রেণীর মানুষদের উন্নীত করা এবং উপকারভোগীদের সাহায্য করা, যেন তারা এ সকল পরিকল্পনার সুযোগ নিতে পারে।

(৪) যেহেতু দান-ধ্যানের কোন সীমা নেই আর এটা কোনরূপ বৈষম্যও প্রদর্শন করে না, তাই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই অন্যান্য বর্ণ ও ধর্মের ভাই ও বোনদের সাহায্য করবে, আর এইভাবে একটি জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত রাখবে।

(৫) ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী কর্তৃক গৃহীত

দিগদর্শন কার্যক্রম শুধুমাত্র গরীবদের জন্য নয়, পাশাপাশি তাদের সঙ্গেও কাজ করে যাচ্ছে, যা আমাদের উন্নয়নমুখী সেবাকাজকে করে তুলছে জনমুখী।

(৬) আমাদের উন্নয়নমুখী সেবাকাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা, অংশগ্রহণ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(৭) আমাদের সামাজিক প্রৈরিতিক সেবাকাজের শীর্ষ অগ্রাধিকার হচ্ছে দরিদ্র, দলিত ও আদিবাসীদের আত্মসচেতন, প্রশিক্ষণদান, সংগঠিত ও ক্ষমতায়ন করা।

(৮) আগামী বছরগুলিতে, আমাদের ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক সেবাকাজধর্মী কার্যক্রমগুলো একটি অগ্রাধিকার হিসেবে তফসিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেছে নেবে।

মানবাধিকার ও আইনী সহায়তা

মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন মণ্ডলীর প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুতরাং, মণ্ডলীকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতিতে সুসমাচারীয় মূল্যবোধগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। এ কারণে বিশপগণ এরূপ পরিস্থিতিতে সুসমাচারীয় মূল্যবোধগুলোর পক্ষে সাক্ষ্যদানের কার্যকারিতার লক্ষ্যে দু'টি বিষয় সুপারিশ করেছেন :

(১) ধর্মপ্রদেশীয় অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে **সামাজিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো** জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র ও শোষিতদের সম্মিলিতভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসার লক্ষ্যে **আইনী সহায়তাকারী সংস্থারগুলোর সঙ্গে যোগ-বন্ধন গড়ে তুলবে** (আদালতের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায্যতা স্থাপনে নতুন সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা)।

(২) তফসিলী জাতি-উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বৈষম্যমূলক আইন-ব্যবস্থা ও রীতিনীতি দূরীকরণে সাধারণ সংস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সমর্থন যোগাবে।

বিশপগণ ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও বলেছেন : উপযুক্ত আইন প্রণীত থাকলেও, তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এটা উপেক্ষিত থেকে যায়। কাজেই নিবেদিতপ্রাণ সাধারণ পুরুষ, নারী ও দলগুলোর করণীয় হবে যেন আইন বলবৎ হয়, যেন বাস্তবে জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা মেলে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনর লক্ষ্যে

মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রেরণকাজ বিষয়ক বিশপগণের ভাবনাগুলো কি, সমানভাবে খ্রীষ্টীয় বলয়ের মধ্যে সুবিদিত? বাস্তবিকপক্ষে, তাদের প্রস্তাবগুলো কি–যে সকল আদর্শের কথা বলা হয়েছে–সেগুলো অর্জনে যথেষ্ট সুস্পষ্ট? বিগত দশকগুলোতে, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যেন আজকের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সাড়া দিতে এবং দক্ষতার সাথে লোকদের, বিশেষ করে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণে কাজ করতে পারে, সে লক্ষ্যে এগুলো কি চূড়ান্তভাবে দিক নির্দেশিত? এ প্রতিষ্ঠানগুলো কি মণ্ডলীর সামাজিক প্রেরণদায়িত্ব পূরণ করছে এবং এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রেম ও ন্যায়ের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে? হয়তবা এ সকল প্রশ্নের জবাবে অনেকের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এক ঝুড়ি 'পাঁচমিশালী' উত্তর। তাদের নিজস্ব দর্শন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তারা গুরুত্বারোপ করবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকগুলোর উপর। উত্তর যা-ই হোক, এ ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন যে, **যীশু ও তাঁর মঙ্গলসমাচারের পক্ষে যথাযথ সাক্ষ্য প্রদানে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার আছে!**

মণ্ডলী তার অধিকাংশ কর্মী (ও অর্থ) তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পিছনে ব্যয় করে। পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান না থাকলেও, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের সংখ্যা পালকীয় ও সামাজিক প্রেরণকাজে নিয়োজিতদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ **বিষয়টি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের কাজকে আরও অত্যাবশ্যক করে তোলে।**

তবে এই কাজটি নিসন্দেহে বিশাল, আর এ কাজকে আরও বেশী কঠিন করে তুলেছে বিশ্বায়নের কারণে চলমান পরিবর্তনধারা। উদাহরণ হিসেবে, শিক্ষার কথাই ধরা যায়। দেশে এবং সাধারণভাবে মণ্ডলীতে, একটি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক (বা বিকল্পধারা) উভয় খাতে আজকের শিক্ষা পরিস্থিতির ব্যাপক নির্ভুল তথ্য যোগাড় দাবি করে। প্রাপ্ত তথ্যকে আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে

নতুন গবেষণার মাধ্যমে, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে। এই তথ্যে স্পষ্টতই দরিদ্রদের শিক্ষা পরিস্থিতির এবং বিদ্যমান ভয়াবহ অসমতা ও অন্যায্যতা সন্নিবেশ ঘটবে। প্রাসঙ্গিক নানা বিকল্প ও কার্যক্রমের অভিজ্ঞতারও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

এর ফলে, বিস্তৃত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ, এর মৌলিক নির্ভরশীলতা ও প্রাসঙ্গিক স্বাধীনতা উভয়ের উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে, বিশ্লেষণ করা সহায়ক হবে। এট সমাজে ও মণ্ডলীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ, এগুলোর মৌলিক বর্ণ/শ্রেণী বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা কাঠামো ও নীতিমালায় নিহিত সমস্যা ও অন্যায্যতার মূল কারণগুলো, আর সেই সাথে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার প্রকৃত তবে সীমিত সম্ভাবনা-শক্তিকে ভালমত বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। **শিক্ষাকে রূপান্তরিত এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার করে তোলার লক্ষ্যে অর্থবহ সম্পৃক্ততার প্রধান প্রধান উপায়গুলিকে আরও বেশী সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার।**

এই আলোকে, মণ্ডলীকে নির্ভয়ে মৌলিক বিষয়গুলোর মুখোমুখি হতে, তার নীতিমালা ও অগ্রাধিকারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত বা ব্যাখ্যা করতে, একটি প্রাসঙ্গিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে, এবং বাস্তব ও সময়োচিত নানা পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে শিক্ষামূলক সেবাকাজের সেরা ধরনগুলো চিহ্নিত করতে, আর সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদ্ধতিগুলো বেছে নিতে হবে। শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দাবি করে, শুধুমাত্র বিদ্যমান কাঠামোগুলোর জন্য উপযুক্ত নীতিমালার বিশদ ব্যাখ্যাই নয়, পাশাপাশি নতুন নতুন পদক্ষেপ দাঁড় করানো, আমাদের কর্মী ও অর্থের উপযুক্ত পুনঃবণ্টন ও সদ্ব্যবহার, আর একই ভাবে কম প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুটিয়ে নেওয়া। **মূল্যায়ন ও দিক নির্দেশনার অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও অনুসৃত হতে হবে।**

এমনকি এ ধরনের একটি সযত্ন বিচার-বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলেও, মণ্ডলীকে অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর সেই সাথে তার স্টাফ মেম্বার, বাসিন্দা ও উপকারভোগী, ও কিছু প্রশিক্ষক, এবং এমনকি জনসাধারণকে মূল্যায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তার আরও উচিত হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাব সংগ্রহ করা, তাদের সঙ্গে বসে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা, আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করা।

যেসব দিক নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে সেগুলো দিয়ে শুরু ক'রে, সি বি সি আই-এর দিক নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ খুঁজে বের করে সেগুলোকে অবশ্যই কার্যকর করে তুলতে হবে। এই মুহূর্তে, সি বি সি আই-এর সুপারিশগুলো বলতে গেলে শুধুমাত্র অনুপ্রেরণাধর্মী। এগুলো বড়জোর সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন ও নিবেদনপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ ও ধর্মসংঘগুলোকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে, আর কিছু লোককে জাগিয়ে তুলতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশ অনেক আর তারা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

তবে, এই প্রক্রিয়াকে বলশালী করে তোলার আর সি বি সি আই দিক নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নকে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান বা ধর্মসংঘ বিপরীত পথে চলে সেগুলোকে গতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত কাঠামোসমূহ ও নীতিমালা অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। আঞ্চলিক ও ধর্মপ্রদেশীয় JDP কমিশনগুলোকে অনুরোধ করা যেতে পারে এ কাজগুলো করার জন্য, অথবা এ লক্ষ্যে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা যেতে পারে। সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানাতে হবে যেন এগুলো প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে কিছু মৌলিক নীতিমালা ও অগ্রাধিকার অনুসরণ করে চলে।

এ পর্যন্ত যা-কিছু প্রস্তাব করা হল, সেগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রস্তাব। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এগুলোর উন্নয়ন ঘটানো দরকার। অথবা এগুলোর চেয়ে ভাল ভাল প্রস্তাবের সন্ধান করতে হবে। তবে তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নবায়িত ও দিক নির্দেশকরণের জন্য মণ্ডলীকে অবশ্যই বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম খুঁজে বের করতে হবে। জনগণের সেবা ও ঐশরাজ্যের বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কঠিন কাজ সম্পাদনে তার রয়েছে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা, কিন্তু এ কাজ করার সাহস কি তার আছে ? এই প্রক্রিয়া শুরু করার তার কি আদৌ কোন ইচ্ছা আছে ?